প্রকাশনায়
সুন্দরবনের আহরণযোগ্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল
দরিদ্র শ্রমজীবীদের অধিকার নিশ্চিতকরণ প্রকল্প
(প্রদীপন-মানুষের জন্য প্রকল্প)

সম্পাদনা উপদেষ্টা
ফেরদৌসউর রহমান
নির্বাহী পরিচালক, প্রদীপন

সম্পাদনা
এ্যাড. মো: এনায়েত আলী
জজ কোর্ট, খুলনা
সদস্য, বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটি
প্রাক্তন চেয়ারম্যান, খুলনা পৌরসভা

সম্পাদনা পরিষদ
সাজ্জাদুর রহমান এলিন
পরিচালক, প্রদীপন

শেখ জাহিদুর রহমান
প্রকল্প সমন্বয়কারী, প্রদীপন-মানুষের জন্য প্রকল্প

প্রকাশকাল
জুলাই ২০০৭

প্রচ্ছদ / গ্রাফিক্স
শেখর বিশ্বাস
অংকুর, খুলনা

মুদ্রণ
প্রচারণী প্রিন্টিং প্রেস
৪৪ স্যার ইকবাল রোড, খুলনা, ০৪১-৮১০৯৫৭

প্রকাশনা তত্ত্বাবধান
শংকর রায়, প্রদীপন
এ.কে.এম মাহবুবুল হাসান, প্রদীপন

স্বত্ব
প্রদীপন
সাহেব বাড়ী রোড, মহেশ্বরপাশা
সৌলতপুর, খুলনা-৯২০৩, বাংলাদেশ।

পটভূমি

উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টি দিন দিনই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে জনগণের অধিকার ও দায়-দায়িত্ব বিষয়টি সম্পর্কে জনগণের ধারণাহীন বা অস্পষ্ট বা অপূর্ণ ধারণা থাকলে উন্নয়নে জনগণের কার্যকরী অংশগ্রহণ ও জনগণের কল্যাণমুখী উন্নয়ন সম্ভব হয় না। উন্নয়নের প্রশ্নে জনগণের অধিকার ও দায়-দায়িত্ব এবং সংরক্ষণ ও ব্যক্তির প্রথম স্তর ইউনিয়ন পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামের জনগণের অধিকার অর্জন এবং প্রদানের স্থানীয় প্রশাসন হিসেবে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত। সেক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী, ক্ষমতা, গঠন কাঠামো ও দায়-দায়িত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে সর্বসাধারণের অস্পষ্ট বা অপূর্ণ বা কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই ধারণা না থাকার ফলে জনগণ তাদের অধিকার সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা করে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে নিজের অধিকার ও ক্ষমতার বিষয়টি অন্যের অপরাধ হিসেবে চালিয়ে দেয়। আবার সে অস্পষ্ট ধারণার জন্য নিজেও অপরাধ বা অন্যান্য সমস্যার সাথে জড়িয়ে পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে তার নিজের ক্ষমতা ও সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারও করতে পারে না। যার ফলে সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন প্রকারণার শিকারও হয়। ইউনিয়ন পরিষদের সাথে তাঁদের দূরত্বও থেকে যায়। নিজেদের অবস্থান ও দায়দায়িত্ব মুখে নিয়ে সমাজে বিরাজমানের পাশাপাশি বেতুবু দানে ব্যর্থ হয়। প্রদীপন মনে করে ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা, কার্যাবলী, গঠন প্রক্রিয়া ইত্যাদি যদি সর্ব সাধারণকে জানানো যায় তাহলে একদিকে তাঁদের অধিকার সম্পর্কে তারা সচেতন হবে, সে অনুযায়ী তাঁরা ভূমিকা রাখতে পারবে। অধিকার আদায় করার মত সক্ষমতা অর্জন করতে পারবে। অন্যদিকে ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সহ অবস্থানের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের প্রাত্যহিক সমস্যা কমে যাবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

উপরোক্ত বিষয়াবলী যাতে উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসরত বিশেষ করে সুন্দরবন সম্পদের উপর নির্ভরশীল দরিদ্র পেশাজীবীরা গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারে ও যৌক্তিকভাবে তার অনুশীলন করতে পারে সে কারণেই ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমা স্থানীয় সরকারের ১৯৮৩ সালে ইউনিয়ন পরিষদ সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশটি প্রণীত হয় যা বিভিন্ন পর্যায়ে সংশোধনীসহ বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন তফসীল নিয়ে অতি সহজভাবে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে। এখানে আইনের কোন ব্যাখ্যা বা বিকৃতি করা হয়নি। শুধুমাত্র কিছু ভাষার সহজ রূপ বা প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ বিষয়ে সকলের গঠনমূলক পরামর্শ বিনীতভাবে প্রত্যাশা করছি।

গভীর আন্তরিকতায়
ফেরদৌসউর রহমান
নির্বাহী পরিচালক
প্রদীপন

স্থানীয় ও সামাজিক দ্বন্দ্ব-কলহ নিরসনে
সালিশ ব্যবস্থার বিকল্প নেই,

আসুন!
ইউনিয়ন পরিষদ ও
জনগণের মিলিত উদ্যোগে
আমরা সচেষ্ট হই
এলাকার সমস্যা
এলাকাতে মিটিয়ে ফেলতে।

প্রচারণায়
প্রদীপন-মানুষের জন্য প্রকল্প

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা: ইউনিয়ন পরিষদ

সহজ আইন সহায়িকা
জুলাই ২০০৭

সম্পাদনায়
এ্যাড. মো: এনায়েত আলী

প্রদীপন

সম্পাদকীয়

স্থানীয় সরকার সমূহের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ শাসন সংক্রান্ত মূল পুস্তিকাটিতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে আলোচনা করতে যেয়ে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধান নিয়েও কথা বলতে হয়েছে।

মূল লক্ষ্য হলো, দেশে সু-শাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে স্থানীয় সরকারের একাংশ ইউনিয়ন পর্যায়ের শাসন কাঠামো কিরূপ নিয়ে আছে এবং কি হওয়া উচিৎ এবং জনগণের কল্যাণে কতটা কর্যকর ভূমিকা রাখার সুযোগ তাদের আছে ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। গণতন্ত্রকে প্রকৃত অর্থে কার্যকর করে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ কতটা ভূমিকা পালন করতে পারে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণ ও গবেষণা প্রয়োজন।

বস্তুত: সংবিধানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য জনকল্যাণ অর্জনে কখনই শাসকগোষ্ঠীর নিকট গুরুত্ব পায়নি। তারা জাতীয় জীবনের এই দীর্ঘ পরিক্রমায় কখনই জনকল্যাণের জন্য ভাবতে আগ্রহী হননি। বরং জনগণকে সংবিধানের বিষয়গুলো সম্বন্ধে অন্ধকারে রেখে রাষ্ট্রীয় ধন সম্পদ লুটপাট করার এক অব্যাহত প্রক্রিয়া হিসেবে শুধুমাত্র ভোটের দেশায় জড়িয়ে থাকা এবং জনগণকে ভোট নামীয় একটি শব্দ দ্বারা আবেগ তাড়িত ও প্রলুব্ধ করে গণতন্ত্রের রক্ষাকারী বলে কথিত রাজনীতিবিদ এমন ভাবসাব ও অন্ত:সারশূন্য বাগাড়ম্বর করে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলতে অভ্যস্থ হয়ে পড়েন, যেন তারাই জনগণের মুক্তির দিশারী।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর প্রায় তিনটি যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেল কোন রাজনীতিবিদের মুখ থেকে (অবশ্য যারা যখন ক্ষমতাসীন থাকেন) কোন দিন প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও জন কল্যাণে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে বহুমুখী সংস্কারের অপরিহার্যতাকে নিয়ে কথা বলতে শুনা যেত না। যা শুনা যেত তা হলো প্রতি ৫ বছর পর একটি করে জাতীয় পর্যায়ের ভোট। যেখানে নিজেদের ধন সম্পদ বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টির প্রতিযোগিতায়, জয়লাভ করার দেশায় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসন যন্ত্রটি নিজেদের করতলগত করার একটি লড়াই করে আসছিল, এ সকল নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে।

রাজনীতিবিদরা (যারা ক্ষমতায় যান) তারা কি সদুত্তর দিতে পারবেন, কেন দীর্ঘকাল ধরে স্থানীয় সরকার গুলোকে অর্থবহ ও শক্তিশালী করা হয়নি প্রকৃত অর্থে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা।

সাধারণ জনগণের ভাগ্য বিড়ম্বনার অপর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো ঔপনিবেশিক আমলের এবং উপনিবেশিক শাসন কাঠামোকে শক্তিশালী রাখতে আমলাদের অনৈতিক স্বার্থ নিরুষ্টক রাখার জন্য প্রণীত অফিসিয়াল দুর্বল এ্যাকট। দেশের গণতান্ত্রিক অবস্থা প্রকৃত অর্থে জন কল্যাণকে ব্যবহার ও শক্তিশালী করতে তাতে আমুল পরিবর্তন আনা ও অনেক বিষয় বাতিল করা দরকার।

একটি সুন্দর ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী আইনের বাধাকে অপসারণ করা প্রয়োজন। তাছাড়া দেশের জনগণের মধ্যে প্রচুর সচেতনতার জন্ম দিয়ে একটি যুগোপযোগী গতিশীল কর্মকাণ্ডের বহর চালু অত্যাবশ্যক। সে উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার সমূহকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে তাদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবার জন্য স্থানীয় সরকারের সঠিক পরিস্থিতির জন্য প্রথমেই শিরোনামে এবং উল্লিখিত বিচারে নিম্নলিখিত পরিবর্তন আনা দরকার। যেমন বলা উচিত হচ্ছে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সরকার আইন। স্থানীয় জিলা সরকার পরিষদ আইন। স্থানীয় থানা / উপজেলা সরকার পরিষদ আইন। স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন।

আমাদের স্বপ্নিল বাংলাদেশের বাস্তব অর্জনের জন্য অর্থবহ ভূমিকা গ্রহণ করুক ক্ষমতায়িত স্থানীয় গ্রাম সরকার সমূহ। এই আশায় রইলাম।

এ্যাড: মোঃ এনায়েত আলী
জুলাই ২০০৭

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা:
ইউনিয়ন পরিষদ

সহজ আইন সহায়িকা
জুলাই ২০০৭

সম্পাদনায়
এ্যাড. মো: এনায়েত আলী

প্রদীপন

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা : ইউনিয়ন পরিষদ

পটভূমিকা ঃ ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা

আমাদের উপ-মহাদেশের শাসন ব্যবস্থা যখন বৃটিশদের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হতো, তখন সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে উপনিবেশিক শাসন কাঠামোতে বিভিন্ন পর্যায়ে সময়ের চাহিদা অনুসারে পরিবর্তন আনতে হয়েছিল। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন ধারণাটি বৃটিশদের আমল থেকে উৎপত্তি হয়েছিল।

পল্লী অঞ্চলকে নিয়ে বৃটিশ আমলে যে সকল আইন প্রণীত হয়েছিল তার কিছু বর্ণনা পাঠকদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

১৮৭৩ সালে লর্ড মেয়োরের আমলে চৌকিদারী আইন প্রণয়ন করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট গ্রাম চৌকিদারী পঞ্চায়েৎ গঠিত হবার ব্যবস্থা হয়।

১৮৮৫ সনে বংগীয় স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন আইন পাশ হয়। এর দ্বারা ইউনিয়ন পর্যায় ইউনিয়ন কমিটি মহকুমা পর্যায় লোকাল বোর্ড এবং জিলা পর্যায় জেলা বোর্ড গঠিত হয়। এই সময় স্থানীয় সরকার পরিচালনায় খানিকটা প্রতিনিধিত্ব মূলক নীতি গৃহীত হয়।

১৯৯৯ সনে একটি আইন পাশ করে পল্লী স্বায়ত্ব শাসন আইনে চৌকিদারী পঞ্চায়েৎ ইউনিয়ন কমিটি বিলুপ্ত করে "ইউনিয়ন বোর্ড" নামে একটি মন্ত্রী স্থানীয় প্রশাসন প্রতিষ্ঠান রাখা হয়। পাকিস্তান শাসন আমলে ১৯৮৫ সনে সামরিক আইন জারী করা হয়। তারপর এ আদেশ দ্বারা ইউনিয়ন পর্যায়ে "ইউনিয়ন কাউন্সিল" থানা পর্যায়ে থানা কাউন্সিল "জিলা পর্যায়ে "জিলা কাউন্সিল" এবং বিভাগীয় পর্যায়ে "বিভাগীয় কাউন্সিল" গঠন করা হয়। কিন্তু সেখানে স্বচ্ছ গণতন্ত্রের প্রতিফলন থাকে না।

১৯৭২ সানে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির ৭ নম্বর আদেশ মূলে আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের সবকটি সংস্থা ভেঙ্গে দেয়া হয়। এ সময় ইউনিয়ন কাউন্সিলের নাম পরিবর্তন হয়ে "ইউনিয়ন পঞ্চায়েৎ" নাম ধারণ করে।

১৯৭৩ সনে রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর ২২ দ্বারা ইউনিয়ন পঞ্চায়েৎ নাম পরিবর্তন করে ইউনিয়ন পরিষদ রাখা হয়।

১৯৭৬ সনে "স্থানীয় সরকার" অধ্যাদেশ জারী করা হয়। এর দ্বারা পুনরায় স্থানীয় সরকারের প্রশাসনকে তিনটি স্তরে ঘোষিত হয় যথা- ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ ও জিলা পরিষদ।

১৯৮০ সনে "স্বনির্ভর গ্রাম সরকার" বিধি প্রণীত হয়। কিন্তু তা শুধু একটি আইন হিসেবে থেকে গেলো। বাস্তবায়ন হলো না।

১৯৮২ সনে ইউনিয়ন পরিষদের জন্য স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ নামে) অধ্যাদেশ জারী করা হয়। উক্ত অধ্যাদেশটি বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সংশোধন নিয়ে বর্তমান অবস্থায় বলবৎ আছে। ঐ অধ্যাদেশ প্রণয়নের ফলে ১৯৭৬ সনের আইনটিকে রহিত করা হয়।

১৯৮৩ সনে উপজেলা পরিষদ গঠন সংক্রান্ত আইন প্রণীত হয়। ১৯৯০ সনে স্থানীয় সরকার (গ্রাম পরিষদ) গঠনের বিধান করা হয়। কিন্তু তা কখনও কার্যকর হয়নি।

১৯৯৮ সনে পুনরায় উপজেলা পরিষদ আইন প্রণয়ন করা হয়। তারও কোন প্রয়োগ ঘটেনি। অনুরূপ ভাবে জিলা পরিষদ গঠনের জন্য আইন করা হয় কিন্তু তারও কোন গণতান্ত্রিক প্রয়োগ দেখা যায় না।

ফলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আইন করা হলেও কোন সময়ের কোন জাতীয় সরকার ঐ সকল স্থানীয় সরকার সমূহ গঠন করে কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হোক এ উদ্দেশ্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীয়করণে কোন আন্তরিক ভূমিকা রাখায় উদ্বুদ্ধ হননি। এটি আমাদের দুর্ভাগ্য।

বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদ সমূহ হলো স্থানীয় সরকারের একটি স্তর। প্রশ্ন ওঠাই উচিৎ স্থানীয় সরকার বলতে আমরা কি বুঝবো। এমন একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে বা পেতে হলে প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে গণতান্ত্রিক কাঠামোর দাবীদার স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের শাসন প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য প্রক্রিয়া কিভাবে আছে ও চলছে। তারই উপর নির্ভর করবে আমাদের আলোচ্য প্রতিপাদ্য আলোচনার রূপ ও সার্থকতা। অবশ্য উল্লিখিত বিষয় নিয়ে তেমন আলোচনা শুরু করার পূর্বে কতকগুলো বিষয় নিয়ে আমাদের কিছু প্রাক ধারনা নিতে হবে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের লক্ষ্যে দেশের শাসন প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনার নিয়মাবলীর নির্দেশিকা গণপরিষদ কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধান : যা হলো দেশের সর্বোচ্চ আইন। বস্তুত অন্য সকল আইন হলো সংবিধানের উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে প্রায়োগিক সহায়ক বিধি বিধান।

বস্তুত: কারণেই, সংবিধানের মালিক হলো দেশের জনগণ। যার প্রমাণ সংবিধানের ৭ম অনুচ্ছেদে প্রতিভাত হয়েছে। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন পর্যায়ে ক্ষমতা ব্যবহারের উৎস হলো মূলত দেশের সংবিধান এবং বিস্তারিত ক্ষেত্রে সংবিধানের পরিপন্থী নয় এমন সব সহায়ক প্রণীত আইনসমূহ যার উৎস হলো দেশের জাতীয় সংসদ। সংবিধানের ৭ম অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে জনগণই প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতার উৎস। সেই ক্ষমতার প্রয়োগ সংবিধানের কর্তৃত্ব ও আলোকে ব্যবহৃত হবে।

বস্তুত: দেশের প্রতিটি নাগরিককে দেশের সংবিধান সম্বন্ধে অল্পবিস্তর চলনসই ধারণা থাকা দরকার। দেশে তেমন সুযোগের অভাব আছে। আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে অর্থবহ ও

সঠিক ধারণার জন্য দায়িত্বশীল দেশপ্রেমিক মহল থেকে ধারাবাহিকভাবে এমন কর্মসূচী গৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সংবিধানের ৯, ১১ ও ৫৯ নম্বর অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকারের বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে অনুচ্ছেদ ৩ টিকে নিম্নে বিবৃত করা হলো।

অনুচ্ছেদ- ৯ :
রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সমূহকে উৎসাহ দান করিবেন এবং এই সকল প্রতিষ্ঠান সমূহে কৃষক, শ্রমিক এবং মহিলাদিগকে যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইবে।

অনুচ্ছেদ- ১১ :
প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে। এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।

অনুচ্ছেদ- ৫৯ :
১) আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।

২) এই সংবিধান ও অন্যকোন আইন সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত অনুরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক একাংশের মধ্যে সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভূক্ত হইতে পারিবে।

(ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য;
(খ) জন শৃঙ্খলা রক্ষা;
(গ) জন সাধারনের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

স্থানীয় সরকারের গঠন প্রণালী, ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সংবিধানের ৪র্থ ভাগের তৃতীয় অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উক্ত তৃতীয় অধ্যায়ে মাত্র দুটি অনুচ্ছেদ আছে, যথা; ৫৯ ও ৬০।

পূর্ববর্ণিত ৫৯ অনুচ্ছেদের সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ :

(ক) দেশের প্রশাসনের প্রত্যেক একাংশের দায়িত্ব স্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর অর্পিত হবে।

(খ) ঐ প্রকারে প্রশাসনের একাংশের জন্য আইনানুসারে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আইন দ্বারা যে সকল ক্ষমতা ব্যবহার নির্ধারণ করা হবে তারা তাই ব্যবহার করবেন, তবে বিশেষ করে তাদের সেই সব ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে অবশ্যই অন্তর্ভূক্ত থাকবে, যথা ; প্রশাসন ও জন কর্মচারী, জন শৃঙ্খলা সংরক্ষণ, জন সেবা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি।

অবশ্য সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদকে কার্যকর করার জন্য সংবিধানের ৬০ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জাতীয় সংসদ যথাযথ আইন প্রণয়ন করে নির্ধারণ করবেন স্থানীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট একাংশের উপর কি ক্ষমতা অর্পন করা হবে। তাহলে দেখা যায় ৫৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য কার্যকর করার বিষয়টি নির্ভর করছে জাতীয় সংসদ ৬০ অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে কেমন আইন প্রণয়ন করবে তার উপর।

একথা বলার অবকাশ রাখেনা যে ইউনিয়ন পরিষদ সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশটি ১৯৮৩ সনে প্রনীত। আজ পর্যন্ত ঐ আইনটিতে বিভিন্ন সময় সংশোধন আনা হয়েছে, কিন্তু অনুসন্ধান করার বিষয়, সত্যিকার অর্থে সংবিধানের ৯, ১১ ও ৫৯ অনুচ্ছেদের অর্ন্তনিহিত ধারনার বাস্তবায়ন ঘটেছে কি না।

১৯৮৩ সনের অধ্যাদেশটিতে বিভিন্ন পর্যায়ের সংশোধনীসহ বর্তমান সময় পর্যন্ত ৮৯টি ধারা ও ৩টি তফসীল নিয়ে অবস্থান করছে। তাছাড়া উক্ত অধ্যাদেশের নির্দেশ অনুসারে বিভিন্ন কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিধিমালা রচিত হয়েছে, যার সংখ্যা হবে ১৬টি।

উক্ত অধ্যাদেশের ৩ক ধারায় ইউনিয়নকে একটি প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

৪-ধারায় ইউনিয়ন পরিষদ গঠন সম্বন্ধে বলা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য দিক হলো সংবিধানের ৯ অনুচ্ছেদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে প্রত্যেক ইউনিয়নে ৩ জন মহিলা সদস্যের জন্য সংরক্ষিত আসন নির্ধারন ও নির্বাচন ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অধ্যাদেশের ৬-ধারায় পরিষদের মেয়াদ কাল ৫ বছর করা হয়েছে।

১২-ধারায় কোন চেয়ারম্যান বা সদস্যের অপসারণের জন্য বিধান করা হয়েছে।

১৮-ধারায় প্রত্যেক ইউনিয়নকে ৯টি ওয়ার্ডে ভাগ করার কথা বলা হয়েছে।

২৪-ধারায় ইউনিয়ন পরিষদ গঠন কল্পে নির্বাচন পরিচালনার বিষয় নিয়ে বিধান করা হয়েছে। নির্বাচন শেষে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি নির্বাচন চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়েরের বিধান করা হয়েছে।

৩০ ও ৩১ ধারায় ইউনিয়ন পরিষদের পুলিশী ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব বিষয় নিয়ে বিধান করা হয়েছে। গ্রাম পুলিশের ক্ষমতা ব্যবহার ও দায়িত্ব পালনের বিষয়টি প্রথম তফসীলের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যাদেশের ৩০ ধারায় বলা হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদের নাগরিক দায়িত্ব সম্বন্ধে।

উক্ত ধারায় দুটি উপধারা সংযোজন করা হয়েছে। যার প্রথমটিতে বলা হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ তফসীল ১ এর প্রথম অংশে বর্নিত ১ হতে ৩৮ দফায় উল্লেখ করা বিষয় সমন্ধে দায়িত্ব পালন করবেন।

বিষয় গুলো নিম্নরূপ

(১) জনপথ ও রাজ পথের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
(২) সরকারী স্থান, উন্মুক্ত জায়গা, উদ্যান ও খেলার মাঠের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
(৩) জনপথ, রাজপথ ও সরকারী স্থানে আলো জ্বালানো।
(৪) সাধারণভাবে গাছ লাগানো ও সংরক্ষণ এবং বিশেষভাবে জনপথ, রাজপথ ও সরকারী জায়গায় গাছ লাগানো ও সংরক্ষণ।
(৫) কবরস্থান, শ্মশান, জনসাধারণের সভার স্থান ও জনসাধারণের অন্যান্য সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা।
(৬) পয়টকদের থাকার ব্যবস্থা ও তাহা সংরক্ষন।
(৭) জনপথ, রাজপথ এবং সরকারী স্থান নিয়ন্ত্রণ ও অনধিকার প্রবেশ রোধকরণ।
(৮) জনপথ, রাজপথ, ও সরকারী স্থানে উৎপাত ও তাহার কারণ বন্ধ করণ।
(৯) ইউনিয়নের পরিচ্ছন্নতার জন্য নদী, বন ইত্যাদির তত্ত্বাবধান, স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন এবং অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।
(১০) গোবর ও রাস্তার আবর্জনা সংগ্রহ, অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।
(১১) অপরাধমূলক ও বিপজ্জনক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণকরণ।
(১২) মৃত পশুর দেহ অপসারণ ও নিয়ন্ত্রণকরণ।
(১৩) পশু জবাই নিয়ন্ত্রণকরণ।
(১৪) ইউনিয়নে দালান নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ নিয়ন্ত্রণকরণ।
(১৫) বিপজ্জনক দালান ও সৌধ নিয়ন্ত্রণকরণ।
(১৬) কুয়া, পানি তুলিবার কল, জলাধার, পুকুর এবং পানি সরবরাহের অন্যান্য কাজের ব্যবস্থাকরণ ও সংরক্ষণ।
(১৭) খাবার পানির উৎস দূষিতকরণ রোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

(১৮) জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সম্ভেদযুক্ত কূপ, পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্যান্য স্থানের পানি ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ।
(১৯) খাবার পানির জন্য সংরক্ষিত কূপ, পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্যান্য স্থানে বা নিকটবর্তী স্থানে গোসল, কাপড় কাঁচা বা পশুর গোসল নিষিদ্ধকরণ বা নিয়ন্ত্রণকরণ।
(২০) পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্যান্য স্থানে বা নিকটবর্তী স্থানে ছন, পাট বা অন্যান্য গাছ ভিজানো নিষিদ্ধকরণ বা নিয়ন্ত্রণকরণ।
(২১) আবাসিক এলাকার মধ্যে চামড়া রঙ করা বা পাকা করা নিষিদ্ধকরণ বা নিয়ন্ত্রণকরণ।
(২২) আবাসিক এলাকার মাটি খনন করিয়া পাথর বা অন্যান্য বস্তু উত্তোলন নিষিদ্ধকরণ বা নিয়ন্ত্রণকরণ।
(২৩) আবাসিক এলাকায় ইট, মাটির পাত্র বা অন্যান্য ভাটি নির্মাণ নিষিদ্ধকরণ বা নিয়ন্ত্রণকরণ।
(২৪) গৃহপালিত পশু বা অন্যান্য পশু বিক্রয়ে ঐচ্ছিক তালিকাভুক্তিকরণ।
(২৫) মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন।
(২৬) জনসাধারণের উৎসব পালন।
(২৭) অগ্নি, বন্যা, শিলাবৃষ্টিসহ ঝড়, ভূমিকম্প বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের তৎপরতার ব্যবস্থাকরণ।
(২৮) বিধবা, এতিম, গরীব ও দুস্থ ব্যক্তিদের সাহায্যকরণ।
(২৯) খেলা ধুলার উন্নতি সাধন।
(৩০) শিল্প ও সামাজিক উন্নয়ন; সমবায় আন্দোলন ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন সাধন ও উৎসাহ দান।
(৩১) বাড়তি খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
(৩২) পরিবেশ ব্যবস্থাপনার কাজ।
৩৩) গবাদি পশুর খোয়াড় নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।
(৩৪) প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের ব্যবস্থাকরণ।
(৩৫) গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের ব্যবস্থাকরণ।
(৩৬) ইউনিয়ন পরিষদের মত সদৃশ কাজে নিয়োজিত অন্যান্য সংস্থার সাথে সহযোগিতা।
(৩৭) জেলা প্রশাসকের নির্দেশক্রমে শিক্ষার উন্নয়নে সাহায্যকরণ।

(৩৮) ইউনিয়নের বাসিন্দা বা পরিদর্শনকারীর উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, আরাম-আয়েস বা সুযোগ-সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঐ সকল দায়িত্ব পালন ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ নিম্নবর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করবে যথা-

(ক) সাধারণভাবে ইউনিয়ন পরিষদসমূহের জন্য বা কোন নির্দিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ঘোষিত; অথবা
(খ) সমকালে প্রচলিত অন্য কোন আইনের অধীনে ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের উপর ন্যাস্ত অন্যান্য দায়িত্ব

অধ্যাদেশের ৩০ ধারার উপধারা ২ এ বর্ণিত নিম্নোক্ত কাজগুলো করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের বিশেষ ভূমিকার কথা বলা হয়েছে, যথা ঃ

(ক) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে প্রশাসনকে সাহায্য করা;
(খ) অপরাধ অনুষ্ঠান, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও চোরাচালান বন্ধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
(গ) কৃষি, বন, মৎস, গবাদি পশু, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কুটির শিল্প, যোগাযোগ, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন, জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে যাহা করা প্রয়োজন;
(ঘ) পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নে কাজ করা;
(ঙ) বাদ দেওয়া হইয়াছে;
(চ) স্থানীয় সম্পদের উন্নয়ন ও তাহার সদ্ব্যবহার;
(ছ) সরকারী সম্পত্তি যেমন, সড়ক, সেতু, খাল, বাঁধ, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ লাইন প্রভৃতির রক্ষণাবেক্ষণ;
(জ) ইউনিয়ন পর্যায়ের সকল প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কর্মতৎপরতা পর্যালোচনা করিয়া সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট থানা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট সুপারিশ পেশ করা;
(ঝ) সেনিটারি পায়খানা স্থাপনের জন্য জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ ও সচেতনতা সৃষ্টি করা;
(ঞ) জন্ম, মৃত্যু, অন্ধ, ভিক্ষুক ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্য রেকর্ডভুক্ত করা;

অধ্যাদেশের ৩১ ধারার আলোকে তফসীল ১ এর দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত দায়িত্ব পালনের ভার গ্রামীণ পুলিশের উপর অর্পিত হয়েছে যাহা নিম্নরূপ ঃ

(১) তিনি ইউনিয়নে দিনে ও রাতে পাহারা দিবেন।
(২) অপরাধ দমন ও উদঘাটনে এবং অপরাধী ধরার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কাজে তিনি তাহার সাধ্যমত পুলিশকে সহায়তা করিবেন।

(৩) চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন পরিষদের সরকারী দায়িত্ব পালনে তিনি সহায়তা করিবেন।
(৪) অন্য কোন নির্দেশ না থাকিলে তিনি প্রতি পনের দিন অন্তর তাহার এলাকার অবস্থা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার-ইন-চার্জকে অবহিত করিবেন।
(৫) তিনি ইউনিয়নের খারাপ চরিত্রের লোকদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখিবেন এবং মাঝে মধ্যে থানার অফিসার-ইন-চার্জকে অবহিত করিবেন্ পাশ্ববর্তী এলাকা হইতে আগত কোন সন্দেহজনক ব্যক্তির উপস্থিতিও তিনি থানার অফিসার-ইন-চার্জকে অবহিত করিবেন।
(৬) ইউনিয়নে লুকিয়ে থাকা কোন ব্যক্তি, যাহার জীবনধারণের জন্য প্রকাশ্য কোন আয় নাই বা যে তাহার নিজের সম্পর্কে সন্তোষজনক কোন বিবরণ দিতে পারিবেন না, এমন লোক সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য তিনি থানার অফিসার-ইন-চার্জকে অবহিত করিবেন।
(৭) ইউনিয়নের সকল বিরোধ, যাহা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা তুমুল কলহের সৃষ্টি করিতে পারে এবং জনগণের শান্তি নষ্ট করিতে পারে এমন সব তথ্য তিনি থানার অফিসার-ইন-চার্জকে অবহিত করিবেন।
(৮) ইউনিয়নে নিম্নলিখিত অপরাধ সংঘটন বা সম্পাদনের অভিপ্রায় সম্পর্কে কোন তথ্য অবগত হইলে তিনি তাহা থানার অফিসার-ইন-চার্জকে অবহিত করিবেন :
(ক) দাঙ্গা,
(খ) গোপনে মৃতদেহ সরাইয়া জন্য গোপন করা,
(গ) মরার জন্য কোন শিশুকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দেওয়া,
(ঘ) আগুনের সাহায্যে ক্ষতি,
(ঙ) বিষ প্রয়োগে পশুর ক্ষতি,
(চ) আত্মহত্যা বা নরহত্যার প্রচেষ্টা, এবং
(ছ) উপরে উল্লিখিত অপরাধ সংঘটন বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচিত করিবার প্রচেষ্টা।
(৯) অন্য কোন বোধগম্য অপরাধ বা ৮নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধ সংঘটন বন্ধ করিতে বা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষেত্রে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।
(১০) তিনি একটা জন্ম ও মৃত্যু রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন এবং তাহার এলাকার সব জন্ম ও মৃত্যু ইউনিয়ন পরিষদকে অবহিত করিবেন।
(১১) মানুষ বা পশু বা শস্যের মধ্যে কোন মহামারী বা সংক্রামক রোগ বা পোকার আক্রমন ব্যাপক আকারে দেখা দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ ইউনিয়ন পরিষদকে অবহিত করিবেন।

পশু বা জীব-জন্তু ধোয়াইলে, গোসল করাইলে বা কাপড় পরিষ্কার করা হইলে।

(৯) কোন পুকুর বা তাহার নিকটবর্তী স্থানে বা এই অধ্যাদেশে নির্দেশিত আবাসিক এলাকা হইতে নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থিত অন্য কোন খনন-এ শন, পাট বা অন্য কোন গাছ ডুবাইয়া রাখিলে।

(১০) ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক নির্দেশিত আবাসিক এলাকার নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে রং পাকা করিলে।

(১১) ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক নির্দেশিত আবাসিক এলাকার নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে মাটি খনন, পাথর বা অন্য কোন বস্তু উত্তোলন করিলে।

(১২) ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক নির্দেশিত আবাসিক এলাকার নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে ইটের ভাটা, চুনের ভাটা, কাঠ-কয়লার ভাটা বা মাটির পাত্রের ভাটা তৈরি করিলে।

(১৩) ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত আবাসিক এলাকার নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে পশুর মৃতদেহ ফেলিলে।

(১৪) এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রয়োজনবোধে কোন জমি বা দালান হইতে ময়লা, গোবর, বিষ্ঠা, সার বা কোন ক্ষতিকর বা অপরাধজনক বস্তু সরাইতে ব্যর্থ হইলে।

(১৫) এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রয়োজনবোধে কোন পায়খনা, প্রস্রাবখানা, ড্রেন, ডোবা বা অন্য কোন ময়লা, মলিন দ্রব্য, পানি, আবর্জনা বা জঙ্গলে আধার বন্ধ, অপসারণ, পরিবর্তন, মেরামত, পরিষ্কার, সংক্রমণমুক্ত, যথাযথ উপায়ে করিতে বা রাখিতে ব্যর্থ হইলে।

(১৬) এই অধ্যাদেশে ঘোষিত স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বা প্রতিবেশীর প্রতি অপরাধমূলক কোন বন, গাছ-গাছড়া বা ঝোপ-জমির মালিক বা দখলদার কর্তৃক সরাইয়া ফেলিতে বা পরিষ্কার করিতে ব্যর্থ হইলে।

(১৭) কোন জমির মালিক বা দখলদার তাহার জমির উপরের ঝোপ কাটিতে বা ঝোপের বর্ধিতাংশ পরিপাটি করিতে ব্যর্থ হইলে, ঝোপের বর্ধিতাংশ বা গাছের ডাল বা রাস্তার উপর পড়িতে পারে বা রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারে বা বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারে বা এই ধরণের ভাল কোন কুয়া, পুকুর বা জনসাধারণের ব্যবহার্য অন্য কোন পানির স্থানের উপর পড়িয়া পানি দূষিত করিতে পারে বা এই অধ্যাদেশে ঘোষিত কোনভাবে তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বা অপরাধমূলক কাজ বলিয়া বিবেচিত হইলে।

(১৮) প্রতিবেশীর প্রতি অপরাধমূলক বা এই অধ্যাদেশে জনস্বাস্থ্যের প্রতি ক্ষতিকর ঘোষিত উপায়ে কোন শস্য উৎপন্ন করিলে, কোন সার প্রয়োগ করিলে বা ভূমিতে পানি সেচ করিলে।

(১৯) এই অধ্যাদেশ মোতাবেক অনুমতি ছাড়া রেশম, ভূমির নিম্নস্থ নর্দমা বা ধার্যযোগ্য ডোবার বস্তু বা অন্য কোন ক্ষতিকর বস্তু জ্ঞানত বা অবহেলাবসত প্রবাহিত বা বাহির করিয়া দিলে বা পানি সেচের নালা বা কোন ভূমির নিম্নস্থ নর্দমা বা ড্রেন রাখিলে বা প্রবাহিত করিলে।

(২০) কোন ভূমির বা দালানের মালিক বা দখলদার নিজস্ব কুয়া, পুকুর, পানির স্থানের পানি যাহা প্রতিবেশীর জন্য ক্ষতিকর বা জনস্বাস্থ্যের প্রতি ক্ষতিকর বলিয়া অধ্যাদেশে ঘোষিত হইয়াছে তাহা পরিষ্কার, পুনঃসংস্কার, ভরাট, বন্ধ বা নিষ্কাশন করিতে ব্যর্থ হইলে।

(২১) কোন জমি বা দালানের মালিক বা দখলদার এই অধ্যাদেশ মোতাবেক দালান বা ভূমি হইতে পানি বা ময়লাযুক্ত পানি গ্রহণ ও বহনের জন্য ঢাকনাহীন সরু পাত্র বা পাইপ উত্তম অবস্থায় রাখিতে ব্যর্থ হইলে।

(২২) কোন ডাক্তার ডাক্তারী করিবার সময় কোন সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হইয়া সে সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদে রিপোর্ট করিতে ব্যর্থ হইলে।

(২৩) কোন দালানে সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হইয়া কোন ব্যক্তি সে সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদে রিপোর্ট করিতে ব্যর্থ হইলে।

(২৪) কোন সংক্রামিত দালানের মালিক দালান সংক্রামণমুক্ত করিতে ব্যর্থ হইলে বা সংক্রামণমুক্ত না করিয়া সংক্রমিত দালান ভাড়া দিলে।

(২৫) সংক্রামক রোগে আক্রান্ত কোন ব্যক্তি খাদ্য বা পানীয় বস্তু বিক্রয় করিলে।

(২৬) কোন গাড়ীর মালিক বা চালক সংক্রমিত গাড়ী সংক্রমণমুক্ত করিতে ব্যর্থ হইলে বা সংক্রমিত গাড়ীতে যাত্রী বহন করিলে।

(২৭) দুধ বা খাদ্যের উপযোগী কোন পশুকে অনিষ্টকর বস্তু, আবর্জনা বা অন্য কোন জঞ্জাল খাওয়াইলে বা খাওয়ার সুযোগ করিয়া দিলে।

(২৮) নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া গোশত বিক্রয়ের জন্য কোন স্থানে পশু জবেহ করিলে।

(১২) কোন বাঁধ বা সেচ কাজে ক্ষতি বা ত্রুটি দেখা গেলে তিনি তৎক্ষণাৎ পরিষদকে অবহিত করিবেন।

(১৩) সরকারী কাজের উদ্দেশ্যে তিনি যে কোন স্থানীয় তথ্য সরবরাহ করিবেন।

(১৪) খাজনা, ভূমি উন্নয়ন কর, স্থানীয় কর, ফি বা অন্য কোন পাওনা সংগ্রহ ও উদ্ধারে তিনি গ্রামের রেভিনিউ অফিসারকে সাহায্য করিবেন।

(১৫) এই অধ্যাদেশের অধীনে কোন অপরাধ সংঘটন বা সংঘটনের অভিপ্রায় সম্পর্কে জ্ঞাত হইলে ইউনিয়ন পরিষদকে অবহিত করিবে।

(১৬) ইউনিয়ন পরিষদে বা ইউনিয়ন পরিষদের অধিকারে ন্যস্ত কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতি বা প্রতিবন্ধকতা বা অনধিকার প্রবেশ সম্পর্কে তিনি তৎক্ষণাৎ ইউনিয়ন পরিষদকে অবহিত করিবেন এবং এই ধরনের ক্ষতি, প্রতিবন্ধকতা বা অনধিকার প্রবেশ রোধ করিবার জন্য হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন।

(১৭) তিনি ইউনিয়নের কোন বাসিন্দার উপর পরোয়ানা জারি করিবেন।

(১৮) ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ এবং ওয়ারেন্ট ছাড়াই তিনি নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে গ্রেফতার করিতে পারিবেন :

(ক) বোধগম্য অপরাধের সহিত জড়িত কোন ব্যক্তি বা যাহার বিরুদ্ধে যথার্থ অভিযোগ উত্থাপন করা হইয়াছে বা বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়া গিয়াছে বা কোন অপরাধমূলক কাজের সাথে তাহার জড়িত থাকিবার যুক্তিগ্রাহ্য কারণ রহিয়াছে;

(খ) বৈধ কারণ ছাড়াই কোন ব্যক্তির নিকট ঘর ভাঙ্গার সরঞ্জাম পাওয়া গেলে।

(গ) সরকারের কোন আদেশ বলে বা ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যপ্রণালীর (১৮৯৮ সালের ৫নং আইনের) অধীনে কোন ব্যক্তিকে অপরাধী ঘোষণা করা হইলে;

(ঘ) কোন ব্যক্তির কাছে পাওয়া কোন মাল চোরাই মাল বলিয়া যথার্থভাবে সন্দেহ হইলে বা এই মাল দেখিয়া সে কোন অপরাধ সংঘটনের সাথে জড়িত আছে বলিয়া যথার্থভাবে সন্দেহ হইলে;

(ঙ) বৈধ তত্ত্বাবধান হইতে কোন ব্যক্তি পালাইয়া গেলে বা পালানোর চেষ্টা করিলে;

(চ) কোন ব্যক্তি কোন সরকারী কর্মচারীকে তাহার সরকারী দায়িত্ব পালনে বাধা দিলে;

(ছ) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী বা বিমান বাহিনীর পলাতক সৈনিক বলিয়া যথার্থভাবে সন্দেহ হইলে;

(জ) মুক্তিপ্রাপ্ত কোন অপরাধী ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যপ্রণালীর (১৮৯৮ সারের ৫নং অধ্যাইনের) ৫৬৫ ধারার (৩) উপ-ধারার কোন বিধান ভঙ্গ করিলে।

(১৯) সাধারণ লোক কোন ব্যক্তিকে বৈধভাবে গ্রেফতার করিলে তিনি তাহাদের সাহায্য করিবেন এবং দেরী না করিয়া এই ধরণের গ্রেফতার সম্পর্কে তিনি থানার অফিসার-ইন-চার্জকে অবহিত করিবেন।

(২০) গ্রামে কর্মরত সরকারী কর্মকর্তা বা কোন সাধারণ লোক সাময়িকভাবে বলবৎ কোন আইন বলে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিলে তিনি তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন এবং তিনি যে ব্যক্তি বা ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের গ্রেফতার করিয়াছেন তাহাদেরকে তৎক্ষণাৎ থানার অফিসার-ইন-চার্জের কাছে হাজির করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, রাতে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের গ্রেফতার করা হইলে তাহাকে বা তাদেরকে গ্রামে বৈধ তত্ত্বাবধানে রাখা যাইতে পারে। কিন্তু পরদিন সকালে সম্ভাব্য তাড়াতাড়ি সময়ে তাহাদের থানায় হাজির করিতে হইবে।

(২১) বিভিন্ন সময়ে আইন অনুযায়ী তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব তিনি পালন করিবেন।

৩৩- **ধারায়** ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন মূলক দায়িত্ব সম্বন্ধে বলা হয়েছে। যার মধ্যে অন্যান্য জিনিষ ছাড়াও আছে কৃষি ও শিল্প।

৩৪- **ধারায়** খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক দায়িত্ব পালনের কথা বলা হয়েছে।

৩৬- **ধারায়** বলা হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত থাকবে। তবে ইউনিয়নের যাবতীয় নির্বাহী ক্ষমতা ইউনিয়ন পরিষদের নামে ব্যবহৃত হবে।

৩৭- **ধারায়** বলা হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি গঠন করতে পারবে এবং যে সকল বিষয় নিয়ে স্থায়ী কমিটি গঠন করবে সে বিষয় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে অধ্যাদেশের ৩৮ ধারায়।

বিষয়গুলি নিম্নরূপ ঃ

(ক) অর্থ ও প্রতিষ্ঠান;
(খ) শিক্ষা ও গণ শিক্ষা;
(গ) স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও মহামারি নিয়ন্ত্রণ;
(ঘ) হিসাব নীতি নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ;
(ঙ) কৃষি ও অন্যান্য উন্নয়ন কাজকর্ম;

(২৯) ক্রেতাকে বশীভূত করিয়া এমন কোন খাদ্য বা পানীয় বস্তু বিক্রয় করিলে যাহা গুণগত মান ও প্রকার ক্রেতার প্রার্থিত বস্তুর মত নয়।

(৩০) নাছোরবান্দা হইয়া ভিক্ষা করিলে বা মহানুভবতা উদ্রেক করিবার জন্য কোন বিকৃত অঙ্গ বা রোগ বা ক্ষতিকর ক্ষত বা আহত অঙ্গ অনাবৃত বা প্রদর্শন করিলে।

(৩১) নিষিদ্ধ এলাকা ঘোষিত স্থানে বেশ্যালয় স্থাপন বা বেশ্যা বৃত্তি করিলে।

(৩২) কোন দালানের মালিক দখলদার এই অধ্যাদেশ মোতাবেক প্রয়োজন অনুযায়ী গৃহ ঝাড়ু দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করিতে ব্যর্থ হইলে।

(৩৩) কোন গাছ বা গাছের ডাল কাটিয়া ফেলা বা কোন দালান বা দালানের অংশ বিশেষ নির্মাণ করা বা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইলে এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিপদের কারণ বাজনগণের কাছে বিবক্তির কারণ বলিয়া ঘোষিত হইলে।

(৩৪) ইউনিয়ন পরিষদের অনুমতি ছাড়া কোন রাস্তা তৈয়ার করা হইলে বা নকশা তৈয়ার করিয়াই প্রকাশ করিলে বা নকশা করিলে বা আরম্ভ করিলে।

(৩৫) নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত অন্য কোন দালান বা স্থানে ঘোষণাপত্র, নোটিশ, প্লেকার্ড বা অন্য কোন কাগজ বা বিজ্ঞাপন লাগাইলে।

(৩৬) কাঠের গুড়ি, কাঠ, শুকনা ঘাস, খড় বা অন্য কোন দাহ্য বস্তু এমন পদ্ধতিতে গাদা করিলে বা সংগ্রহ করিলে যাহা এই অধ্যাদেশে ক্ষতিকর বলে ঘোষিত হইয়াছে।

(৩৭) এ অধ্যাদেশ অনুযায়ী অনুমতি ছাড়া কোন রাস্তায় পিকেটিং, পশুর সমাবেশ বা গরুর গাড়ী বা মোটর গাড়ী সংগ্রহ বা কোন রাস্তাকে গাড়ী ও পশুর বিরতির স্থান বা অস্থায়ী শিবির স্থাপন করিলে।

(৩৮) পশুকে ইতস্তত ভ্রমণ করিতে দেওয়া বা ইতস্তত ভ্রমণ করিবার কারণ ঘটাইলে।

(৩৯) যথার্থ আলো ছাড়া সন্ধ্যার আধা ঘন্টা পর হইতে সূর্যোদয়ের আধা ঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত কোন গাড়ী চালনা করিলে বা সম্মুখ দিকে চালিত করিলে।

(৪০) কোন যথার্থ কারণ ছাড়া বাম দিক দিয়া গাড়ী চালিত করিলে বা সম্মুখ দিকে চালিত না করা হইলে বা কোন গাড়ী একই দিকে যাওয়ার সময় একটি অপরটির ডান দিক হইতে অতিক্রম না করিলে বা রাস্তার অন্য কোন আইন প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে।

(৪১) এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী কোন সাধারণ বা বিশেষ নিষেধ লংঘন করিয়া বাদ্যযন্ত্র বা রেডিও বাজাইলে, ড্রাম বা টমটমে আঘাত করিলে, বারুদ রাখার পাত্র বা তুড়ি উড়াইয়া দিলে বা পিতল বা অন্য কোন বস্তু বা তৈজসপত্রে আঘাত বা শব্দ করিলে।

(৪২) আগ্নেয়াস্ত্র ছোড়া বা আতশবাজি, পটকা, অগ্নিবেলুন বা বিস্ফোরক ফুটাইলে বা এমনভাবে কোন খেলা করিলে যাহার ফলে কোন পথচারী বা বসবাসকারী বা নিকটবর্তী এলাকায় কাজে নিয়োজিত ব্যক্তির ক্ষতি হওয়ার কারণ হইতে পারে অথবা সম্পত্তির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(৪৩) পাথর খান খুঁড়িলে, বিস্ফোরক ঘটাইলে, গাছের গুড়ি কাটিলে বা দালান ভাঙ্গার কাজ এমনভাবে সম্পাদন করিলে যাহার ফলে পথচারী বসবাসকারী বা নিকটবর্তী এলাকায় কাজে নিয়োজিত ব্যক্তির ক্ষতি হইতে পারে বা ক্ষতির কারণ হইতে পারে।

(৪৪) এই অধ্যাদেশ মোতাবেক প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়া নির্ধারিত কবরস্থান বা শশ্মান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে মৃতদেহ কবর দেওয়া বা পোড়ানো।

(৪৫) হিংস্র কুকুর বা অন্য কোন বিপজ্জনক জন্তু বন্ধনমুক্ত করিলে বা লেলাইয়া দিলে।

(৪৬) এই অধ্যাদেশে কোন দালানকে বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষণা করা হইলে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বা অন্য কোনভাবে নিরাপদ রাখিতে ব্যর্থ হইলে।

(৪৭) এই অধ্যাদেশে কোন দালান মানুষের বসবাসের অনুপযোগী বলিয়া ঘোষণা করা হইলে, সে দালানে মানুষের বসবাসের অনুমতি দিলে বা ব্যবহার করিলে।

(৪৮) এই অধ্যাদেশের আওতায় প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়া কোন দালান নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ করা হইলে।

(৪৯) এই অধ্যাদেশের আওতায় কোন দালানে প্রয়োজনীয় চুনকাম করিতে বা মেরামত করিতে ব্যর্থ হইলে।

(৫০) এই অধ্যাদেশ মোতাবেক অথবা ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা ইউনিয়ন পরিষদের কোন অফিসার, কর্মচারীকে দায়িত্ব পালনে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা দিলে।

(৫১) ইউনিয়ন পরিষদের কোন কর্মচারী ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে, সাথে বা ইউনিয়ন পরিষদ দ্বারা সম্পাদিত যে কোন চুক্তিকে জ্ঞানত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজের বা অংশীদারের জন্য কোন অংশ বা স্বার্থ অর্জন করিলে।

(চ) সমাজ কল্যাণ ও সমাজ কেন্দ্র (কমিউনিটি সেন্টার)
(ছ) কুটির শিল্প ও সমবায়;
(জ) আইন শৃঙ্খলা;
(ঝ) নারী ও শিশুকল্যাণ, সংস্কৃতি ও খেলাধুলা;
(ঞ) মৎস্য চাষ ও পশু পালন;
(ট) পরিবেশ সংরক্ষণ ও বৃক্ষ রোপন;
(ঠ) ইউনিয়ন গণপূর্ত (রাস্তাঘাট ইত্যাদি)
(ড) গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও পয়স্বাস্থ্য (সেনিটেশন)

২০-ক **ধারায়** বিধান অনুসারে নির্ধারিত সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য।

৩৮-ক **ধারা** অনুসারে সমাজ উন্নয়ন কমিটি নামে যে একটি কমিটি গঠনের জন্য বিধান করা হয়েছে, ঐ কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব অর্পিত হবে।

৪২-**ধারায়** ইউনিয়ন পরিষদের কাজের স্বার্থে অফিসার ও কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবে।

৪৩-**ধারায়** ইউনিয়ন পরিষদের তহবীল গঠনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যার মধ্যে আছে -

(ক) সকল কর, ফিস ও আদায়কৃত অন্যান্য আয়।
(খ) ইউনিয়ন পরিষদের সম্পত্তির ভাগ, মুনাফা ইত্যাদি।
(গ) অন্য কোন উপায়ে প্রাপ্য বৈধ অর্থ
(ঘ) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ;
(ঙ) কোন ট্রাষ্ট থেকে প্রাপ্ত অর্থ;
(চ) সরকার বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রাপ্ত অনুদান ইত্যাদি;

৪৪-**ধারায়** বলা হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদের তহবিলের সকল অর্থ সরকারী ট্রেজারীতে অথবা সরকারী কাজকর্ম করে এরূপ ব্যাংকে জমা রাখতে হবে এতে আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে। ইউনিয়ন পরিষদের অর্থ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কিভাবে ব্যয় করতে হবে তা ৪৫ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে।

৪৭-**ধারায়** বলা হয়েছে কিভাবে ইউনিয়ন পরিষদের প্রতি অর্থ বছরের বাজেট বা প্রস্তাবিত আয়-ব্যয় নির্ধারণ করতে হবে। প্রস্তাবিত বাজেট জেলা প্রশাসকের নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হবে।

৪৯-**ধারায়** ইউনিয়ন পরিষদের আয়-ব্যয়কে কেন্দ্র করে অডিট সম্পন্নের কথা বলা হয়েছে।

৫১-**ধারায়** বলা হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদের প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ জেলা প্রশাসক কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। করারোপ বা অন্যান্য ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদকে

অধ্যাদেশের বিধানাবলী ও বিধিমালা ছাড়াও সরকারের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলী মেনে চলতে হবে।

৫৯-**ধারায়** করধার্য বিষয় নিয়ে বিধি প্রনয়ন ও তদানুসারে কর ধার্যের বিষয় বলা হয়েছে।

৬০ ও ৬১-**ধারার** বর্ণনা অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী তদারকি ও প্রয়োজন বোধে নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সরকারের।

৬৩-**ধারায়** বলা হয়েছে সরকার স্ব উদ্যোগে অথবা কোন অভিযোগের ভিত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী তদন্ত করতে পারবে।

৬৪-**ধারায়** বলা হয়েছে ৬৩ ধারায় উত্থাপিত অভিযোগ প্রমানিত হলে সরকার জনস্বার্থে ইউনিয়ন পরিষদ ভেঙ্গে দিতে পারেন।

৬৯-**ধারায়** অপরাধ বিষয় নিয়ে বিধান করা হয়েছে। বলা হয়েছে অধ্যাদেশের তৃতীয় তফসীলে অপরাধ সমূহের তালিকা দেয়া হয়েছে। যা নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

(১) ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত কর বা বৈধভাবে অন্য কোন আরোপিত কর প্রদান এড়ানোর জন্য ওজর দেখাইলে।

(২) এই অধ্যাদেশের যে কোন বিধি-বিধান অনুযায়ী অর্পিত ক্ষমতা মোতাবেক ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক নির্দেশিত কোন তথ্য সরবরাহে ব্যর্থতা বা ভুল তথ্য সরবরাহ করিলে।

(৩) এই অধ্যাদেশের যে কোন বিধি-বিধান অনুযায়ী কোন কাজের জন্য লাইসেন্স বা অনুমতি গ্রহণের বিধান থাকা সত্ত্বেও লাইসেন্স বা অনুমতি ছাড়া কোন কাজ করিলে।

(৪) ইউনিয়ন পরিষদের অনুমতি ছাড়া কোন বিপজ্জনক বা অপরাধমূলক ব্যবসা করিলে বা কোন বিপজ্জনক বা অপরাধমূলক বস্তু গুদামজাত করিলে।

(৫) ইউনিয়ন পরিষদের অনুমতি ব্যতীত কোন জনপথ বা রাজপথ ও সরকারী জায়গায় অনধিকার প্রবেশ করিলে।

(৬) খাবার পানি দূষিত ও ব্যবহারের অযোগ্য হয়, এমন কোন কাজ করিলে।

(৭) জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সন্দেহে কোন স্থানের পানি ব্যবহার করা এই অর্ডিন্যান্স নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও সে স্থানের পানি স্থানীয় পানি হিসাবে ব্যবহার করিলে।

(৮) জনসাধারণের খাবার পানির কোন কুয়া বা ইহার নিকটবর্তী স্থানে গৃহপালিত

(৭) প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য ১৯৫৯ সনে তদানিন্তান পকিস্থানের সামারিক শাসন ঘোষিত হলে সামরিক প্রধান ও রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খানের মাদেশ বলে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ (অর্থাৎ ১৯৫৯ সালের ১৮ নং রাষ্ট্রপতির আদেশ) এর আওতায় পরবর্তীতে ১৯৬৩ সনে স্থানীয় পরিষদ কার্য বিধিমালা ১৯৬৩ নামে একটি বিধিমালা প্রণীত হয়। যে বিধিমালার কার্যকরীতা ইউনিয়ন পরিষদ বিষয়ে ১৯৮৩ সলের অধ্যাদেশ প্রণীত হবার পর হতে অদ্যাবধি বলবৎ আছে বিধায় উক্ত বিধিমালার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো সম্বন্ধে ইউনিয়ন বাসীর একটি ধারণা থাকা দরকার। উক্ত বিধিমালার ৩ নম্বর বিধিতে বিভিন্ন কার্যাবলীর একটি তালিকা প্রদান করা হয়েছে। নিবিমালাতে মোট ১২টি বিধি সংযোজিত আছে।

বর্তমান ক্ষেত্রে বিধি ৬ ও বিধি ৭ (২) প্রযোজ্য নেই।

স্থানীয় পরিষদ অর্থ্যাৎ এই ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ উক্ত ১৯৬৩ সনের বিধিমালার ৩ নম্বর বিধির আওতায় প্রদর্শিত বিষয়াবলী নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যা

নিম্নরূপ ঃ

(ক) কর, রেট, টোল বা ফি ধার্যকরণ সম্পর্কিত সকল প্রস্তাব;

(খ) বার্ষিক বাজেট ও আর্থিক বিবরণী;

(গ) সংশোধিত বাজেট;

(ঘ) ঋণ সংগঠিত করা বা আর্থিক দনায়-দনা সংশ্লিষ্ট অঙ্গীকার প্রদানের জন্য সকল প্রস্তাব;

(ঙ) স্থানীয় তহবিল হইতে ব্যয়ের কর্তৃত্ন্নায়নের জন্য সকল প্রস্তাব;

(চ) চলতি বছরের বাজেটে অন্তর্ভুক্ত নাইই এমন ব্যয়সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্র;

(ছ) স্থানীয় পরিষদে কৃষি, শিল্প ও সম্প্রদায় উন্নয়ন সম্পর্কিত সকল প্রস্তাব;

(জ) বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সকল পরিকল্পনা;

(ঝ) স্থানীয় পরিষদ কর্তৃক বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন ও তাহাদের বাস্তবায়ন নিয়ন্ত্রণকারী কার্যপ্রণালী;

(ঞ) স্থানীয় পরিষদ কর্তৃক নির্মাহকৃতব্য পূর্বের নকশা ও প্রাক্কলন;

(ট) সকল উন্নয়ন নকশা; এবং

(ঠ) অপরিহার্য জনস্বার্থ ও জননীতি সম্পৃক্ত সকল বিষয়াদি।

৫ নম্বর বিধি মূলে চেয়ারম্যান কর্তৃক যে সকল কার্য নিষ্পত্তি হবে তার একটি বর্ণনা দেয়া হয়েছে যা ৫(২) তে নিম্নরূপে বর্ণিত:

(ক) স্থানীয় পরিষদের সদস্য নন এমন স্থানীয় পরিষদ চাকুরির যেকোন চাকুরিজীবীর নিয়োগ, বদলি, শাস্তি বা অপসারণ যাহার বেতন নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সহকারে স্থানীয় পরিষদ কর্তৃক যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইতে পারে সেইরূপ সীমা অতিক্রম করে না;

(খ) সকল কর, রেট, টোল, ফিস ও অন্যান্য ন্যায্য পাওনা;

(গ) স্থানীয় পরিষদের পক্ষে সকল পরিমানের অর্থ গ্রহণ;

(ঘ) অনুমোদিত বাজেটের মধ্যেকার যেকোন সামগ্রীর উপর নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সহকারে স্থানীয় পরিষদ কর্তৃক যেরূপ বিনির্দিষ্ট হতে পারে সেইরূপ সীমা অতিক্রম করে নাই এমন ব্যয়ের বোঝা মাথায় নেওয়া;

(ঙ) স্থানীয় পরিষদের পক্ষে সকল পত্র যোগাযোগ পরিচালনা;

(চ) স্থানীয় পরিষদের পক্ষে বিজ্ঞপ্তি ইস্যুকরণ;

(ছ) আদেশের (অধ্যাদেশের) অধীন সকল অপরাধের মীমাংসাকরণ; এবং

(জ) ৩ বিধিতে বিনির্দিষ্ট কার্য নয় এমন অন্য যেকোন কার্য যাহা নিষ্পন্ন করার জন্য নিয়ন্ত্রণকারী কতৃপক্ষ, লিখিত আদেশ বলে, চেয়ারম্যানকে কর্তৃত্ব প্রদান করতে পারেন।

বিধিমালাটি সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করে তোলা আবশ্যক।

(৮) স্থানীয় পরিষদ (চুক্তি) বিধিমালা ১৯৮১ :

এতে ১২টি বিধি আছে যার মধ্যে ৪ নম্বর বিধিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেননা এই বিধিতে চেয়ারম্যান, মেম্বর বা ইউনিয়ন পরিষদের কোন কর্মচারীর আত্নীয়ের সাথে ইউনিয়নের কর্ম সংক্রান্ত কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া যাবে না। এ বিধিতে আত্নীয় বলতে কাদের বুঝাবে তার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে যা নিম্নরূপ :

(ক) পিতা-মাতা;

(খ) সন্তানাদি ও তাদের বংশধর যত নিচের দিকেই হোক;

(গ) পিতা-মাতাসহ যত উপরের দিকেই হোক;

(ঘ) ভাই ও বোন এবং তাদের বংশধর যত নিচের দিকেই হোক;

(ঙ) স্ত্রী ও স্বামী;

(চ) শ্বশুর বা শাশুড়ি এবং জামাতা বা পুত্রবধূ;

(ছ) স্ত্রীর বা স্বামীর ভাই ও বোন এবং তাদের বংশধর যত নিচের দিকেই হোক;

(জ) স্ত্রীর বা স্বামীর কাকা-খালু ফুফা- মামা ও কাকী-খালা ফুফু- মামী এবং তাদের বংশধর যত নিচের দিকেই হোক;

(ঝ) সৎ ভাই ও বোন এবং তাদের বংশধর যত নিচের দিকেরই হোক;

(ঞ) সৎ ছেলে ও মেয়ে এবং তাদের বংশধর যত নিচের দিকেই হোক;

(ট) কাকা-কাকী, ফুফা-ফুফু, মামা-মামী, খালা-খালু এবং তাদের বংশধর যত নিচের দিকেই হোক; এবং

(ঠ) পালক ছেলে ও মেয়ে এবং তাদের বংশধর যত নিচের দিকেই হোক।

(৯) স্থানীয় পরিষদ (পরিদর্শন) বিধিমালা ১৯৬১ :

এই বিধিমালাটিতে মোট ৬টি বিধি থাকে। কিন্তু এর কতকগুলো বিধি বর্তমান পর্যায় অপ্রযোজ্য হিসেবে অবস্থান করছে। যেমন ২ নম্বর বিধির (১) উপবিধির অধীনে (অ) (আ) (ই) (উ) দফা সমূহ। অনুরূপভাবে ১ বিধিটিরও প্রয়োগ নেই। ৫ বিধির (২) উপবিধির (ক) (খ) (গ) (ঘ) দফা সমূহের প্রয়োগ নেই। অনুরূপভাবে (০৬) দফাটির (আ) উপবিধিটিও এখন অপ্রযোজ্য। বস্তত: বিধিমালাটির মূল লক্ষ্য হলো ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকলাপ দাপ্তরিকভাবে যথাযথ কতৃপক্ষ কর্তৃক পরিদর্শন সংশ্লিষ্ট। এব্যাপারে তথ্য সমূহ ইউনিয়নবাসীকে অবহিত করা সমিচীন।

(১০) ইউনিয়ন পরিষদ (বাজেট তৈরীকরণ ও অনুমোদন) বিধিমালা ১৯৬০ :

এই বিধিমালাটিতে বর্তমান অবস্থার ১১টি বিধিবলবৎ আছে বস্তুত এই বিধিমালাটি দ্বারা একটি ইউনিয়নের বাৎসরিক আয়-ব্যয় সংক্রান্ত একটি বাজেট বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে প্রস্তুত করতে হবে। যার মধ্যে থাকবে ঐ আর্থিক বছরের জন্য কোন কোন খাত থেকে কত টাকা পাওয়া যাবে এবং অর্জিত অর্থ কোন কোন খাতে কত টাকা হিসেবে ব্যয় করা হবে। আসলে কোন বাজেট একেবারেই সুনির্দিষ্ট করে বলা যায় না। কত টাকা আয় হবে। এইজন্য বাজেটের সবকিছুকে প্রাক্কলিত বলে আখ্যায়িত করা হয়। অবস্থা ও পরিস্থিতির উপর আয়-ব্যয়ের বিষয়টি অনেকাংশে নির্ভরশীল। ইউনিয়ন বাসীদের সকলেই তাদের ইউনিয়নের বাৎসরিক আয়-ব্যয় ও খাত সমূহ সম্বন্ধে একটি প্রাথমিক ধারণা থাকা বাঞ্চনীয়। এ উপলক্ষ্যে বাজেট তৈরীকরণ ও অনুমোদন বিধিমালা ১৯৬০ সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গণ সচেতনতায় নিয়োজিত এনজিও প্রতিষ্ঠানসমূহের এ ব্যাপারে আন্তরিক ও অর্থবহ ভূমিকা গ্রহন করা আবশ্যক।

(১১) ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালা ২০০২ :

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আচরণ বিধিমালাটি প্রণীত। প্রকৃত গনতন্ত্র চর্চা এবং সুষ্ঠু, সুন্দর প্রভাবমুক্ত স্বচ্ছ ও গ্রহনযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্বার্থে বিধিমালাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের জাতীয় রাজনৈতিক জীবনে আমাদের স্বতপই হল রাজনীতিবিদসহ রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত কট্টোর সমর্থকদের গণতান্ত্রিক আচরণ মেনে না চলা। উক্ত বিধিমালাটিতে মোট ১১টি বিধি আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিধি হলো বিধি ৬,৭,৮,৯,১০।

৬নং বিধিতে নির্বাচনী প্রচারণা সম্বন্ধে বিধান করা হয়েছে। তাতে ক হতে ঢ পর্যন্ত মোট ১৪টি উপবিধি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যা বস্তুত একটি সুষ্ঠু, সুন্দর, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্বার্থে উপদফাসমূহে প্রদত্ত নির্দেশাবলী মেনে চলা দরকার।

জনগনের পূর্ণ অবগতির জন্য উপদফাগুলো নিম্নবর্ণিত হলো।

(ক) প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রার্থী নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার থাকবে, প্রতিপক্ষের কোন সভা, মিছিল এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান পন্ড করা বা উহাতে বাধা প্রদান করা যাবে না;

(খ) কোন প্রার্থীর পক্ষে আয়োজিত জনসভা বা মিছিলের দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে পূর্বেই স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ এবং প্রতিপক্ষকে অবহিত করতে হবে;

(গ) পুলিশ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত জনগণের জন্য ব্যবহার্য কোন সড়কে কোন জনসভা করা যাবে না;

(ঘ) কোন সভা-সমাবেশ বা মিছিল বাধাদানকারী বা অন্য কোনভাবে গোলযোগ সৃষ্টিকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রার্থী বা অন্য কোন ব্যক্তি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার শরণাপন্ন হতে পারবেন, নিজেরা কোন সহিংস বা অন্যবিধ প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারবেন না;

(ঙ) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কেহ নির্বাচনী কাজে সরকারী প্রচার যন্ত্র, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী বা সরকারী যানবাহন ব্যবহার অথবা অন্য কোন প্রকার সরকারী সুযোগ-সুবিধা গ্রহন করতে পারবেন না;

(চ) নির্বাচনী প্রচারের উদ্দেশ্যে কোন তোরণ বা গেট নির্মাণ আলোকসজ্জা অথবা জাকজমকপূর্ণ প্রচারণা করা যাবে না;

(ছ) কোন প্রার্থীর পোষ্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিলের উপর অন্য কোন প্রার্থীর পোষ্টার লিফলেট বা হ্যান্ডবিলের কোন প্রকার ক্ষতি সাধন তথা বিকৃত বা বিনষ্ট করা যাবে না;

(৫২) এই অধ্যাদেশে বর্ণিত অপর কোন কাজ সম্পাদন করিলে যাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য।

(৫৩) এই অধ্যাদেশে বর্ণিত বা পরে ঘোষিত যে কোন শর্ত, আইন বা বিধি বা কোন আদেশ, নির্দেশ নোটিশ বা ঘোষনা লঙ্ঘন করিলে।

(৫৪) উপরে উল্লিখিত যে কোন অপরাধমূলক কাজের চেষ্টা বা অপরাধমূলক কাজের প্ররোচনা দিলে।

৭৪-**ধারায়** বলা হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদের কোন আদেশ দ্বারা কেউ সংক্ষুব্ধ হলে আদেশের ৩০ দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করতে পারবেন।

৭৮-**ধারায়** সুযোগ রাখা হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ অথবা এর চেয়ারম্যান ও সদস্য বা কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কেউ কোন মামলা দায়ের করতে চাইলে তা পারবেন। কিন্তু শর্ত আছে এক মাসের প্রাক নোটিশ প্রদান করতে হবে মামলার কারণ উল্লেখ করে। ১৯৮৩ সনের ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশের বিধানাবলী অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের স্বার্থে ৮৩ ধারার ক্ষমতাবলে সরকার প্রয়োজনীয় বিধিমালা বা রুলস প্রণয়ন করতে পারবেন। ধারা ৮৪ তে ইউনিয়ন পরিষদকে তাদের বিভিন্ন কার্য পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজন হলে এবং অধ্যাদেশ বা কোন বিধিমালা দ্বারা সংকুলান না হলে প্রবিধান প্রণয়নের অধিকার থাকে। বিষয়গুলো নিম্নরূপ ঃ

(ক) ইউনিয়ন পরিষদের বৈঠক পরিচালনা;

(খ) বৈঠকের ফোরাম নির্ধারণ;

(গ) প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা;

(ঘ) বৈঠক তলব;

(ঙ) বৈঠকের কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করণ;

(চ) প্রস্তাবাবলী বাস্তবায়ন;

(ছ) স্থায়ী কমিটিসমূহ ও তাদের কার্যাবলী সংক্রান্ত বিষয়াদি;

(জ) সাধারণ সীলের হেফাজত ও ব্যবহার ;

(ঝ) চেয়ারম্যানের ক্ষমতা ইউনিয়ন পরিষদের যে কোন সদস্য বা অফিসার কিংবা কর্মচারীর নিকট অর্পন;

(ঞ) ইউনিয়ন পরিষদের অফিসকে বিভিন্ন বিভাগ ও শাখায় বিভক্তিকরণ এবং এই সব বিভাগ ও শাখার কাজের সংজ্ঞা প্রদান;

(ট) জন্ম ও মৃত্যু রেজিষ্ট্রিকরণ;

(ঠ) গবাদি পশু ও জন্তুর বিক্রয় রেজিষ্ট্রিকরণ;

(ড) সাধারণ সম্পত্তি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ;

(ঢ) শ্মশান ও কবরস্থান নিয়ন্ত্রণ;

(ন) সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;

(ত) অনধিকার প্রবেশ রোধকরণ;

(থ) গবাদি পশুর খোয়াড় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি; অবশ্য ধারা ৮৫ এর ক্ষমতা বলে ঐ সকল প্রবিধান ডেপুটি কমিশনার দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদ প্রবিধানমালা প্রনয়ণ কালে সরকার কর্তৃক মডেল প্রবিধানমালা প্রণীত থাকলে তা অনুসরণ করতে হবে।

৮৬-**ধারাতে** একটি বিধান করা হয়েছে যাতে ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব পালনে কোন ব্যাপারে অধ্যাদেশ বা বিধিমালায় অপ্রতুলতা দেখা দিলে সেক্ষেত্রে নির্দেশিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এবং পদ্ধতিতে সম্পন্ন করতে হবে। বস্তুত সংকট নিরসনের স্বার্থে ধারাটি সংযোজন করা হয়েছে।

৮৮-**ধারার** দ্বারা স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ ১৯৭৬ কে বাতিল করা হয়েছে কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে। বস্তুত উক্ত ১৯৭৬ সনের অধ্যাদেশ বাতিল করা হলেও তার অধীনে কৃতকর্ম সমূহকে যতদূর সম্ভব স্বীকৃতি ও বলবৎ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৮৯-**ধারাটি** শেষ ধারা হিসেবে ১৯৮৩ সনের অধ্যাদেশে সংযোজন করা হয়েছে। বস্তুত: এ ধারাটির লক্ষ্য হলো মূল অধ্যাদেশের কোন ধারা কার্যকর করতে কোন প্রকার সমস্যার সৃষ্টি হলে তা সরকার আদেশ দ্বারা দূরীকরণ করতে পারবেন। ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর নির্দেশিত ও অর্ন্তভুক্ত দায়িত্ব ও কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য ধারা ৮৩ এর ক্ষমতা বলে সরকারের প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ সংক্রান্ত বিধিমালা প্রনয়নের অধিকার আছে এবং উক্ত ক্ষমতাবলে সরকার বেশ কিছু বিধিমালা প্রণয়ন করেছেন। যথা;

(১) ইউনিয়ন পরিষদ (নির্বাচন) বিধিমালা - ১৯৮৩ :

এতে ৬৯টি বিধি সংযোজন করা হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, উক্ত বিধিমালা দ্বারা ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন সংক্রান্ত সকল প্রক্রিয়া শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন বিধির মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। আসলে উক্ত বিধিমালাটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠন কল্পে ইউনিয়নের প্রতিটি নাগরিকের বিশেষভাবে জানার প্রয়োজন। যেহেতু আমাদের

সমাজের ১০০% ভাগ মানুষ শিক্ষা-দীক্ষায় গড়ে উঠতে পারেনি। সেক্ষেত্রে উক্ত বিধিমালাটি সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে অবহিত ও জ্ঞান সমৃদ্ধ করার জন্য কোন না কোন স্বেচ্ছাসেবী অথবা এনজিও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা গ্রহণ করা উচিৎ। তেমন সম্ভব হলে প্রচুর সুফল অর্জিত হবে এবং ইউনিয়ন পরিষদের গঠন এবং কর্মপরিচালনার ক্ষেত্রে গুণগত মান সৃষ্টি হবে এবং আমাদের সকলের প্রত্যাশা তাই হওয়া উচিৎ।

(২) ইউনিয়ন পরিষদ কর্মচারী (ভবিষ্যৎ তহবিল এবং আনুতোষিক) বিধিমালা ১৯৯৪ :

উক্ত বিধিমালায় ২৩টি বিধি আছে এবং এর মূল লক্ষ্য হলো ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে বিভিন্ন শ্রেণীর যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ প্রাপ্ত হন, তাদের বিভিন্ন ধরণের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান করা হয়েছে। বিধিমালার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কেননা যে সকল কর্মচারী কর্মকর্তারা সারা জীবন ধরে ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ড পরিচালনা, জনগণের সেবা প্রদান ও ইউনিয়ন পরিষদের সাফল্য অর্জনে নিয়োজিত থাকবেন তাদের কর্মকালীন ও জীবন সায়াহ্নে জীবনধারণের একটি সুযোগ থাকা সামাজিক চাহিদা। এ বিধিমালাটি সম্বন্ধে শুধু মাত্র কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের অবহিত হওয়ার বিষয় নয়। ইউনিয়নবাসীরও জানার বিষয় কেননা তাদের প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকারের কর প্রদান ও আর্থিক সহযোগিতায় ইউনিয়ন পরিষদের বৃহত্তম কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে থাকে।

(৩) তাদের শপথ (ইউনিয়ন পরিষদ) বিধিমালা ১৯৮৩ :

এটি একটি ছোট বিধিমালা মাত্র ৩টি বিধি দ্বারা বিধিমালাটি প্রনীত। উদ্দেশ্য হলো যারা ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত হবেন তাদের দায়িত্ব প্রাপ্তীর পূর্বে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে শপথ গ্রহণ করবেন, ফলে শপথ লংঘন না করে তারা যেন তাদের দায়িত্ব পালন করেন। তাদের শপথ গ্রহণ হবে উপজেলা চেয়ারম্যান অথবা সেই কর্তৃক নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তির উপস্থিতিতে একটি সময়সীমা নিয়ে। নির্বাচিত হয়ে নাম প্রকাশের তারিখ হতে ৩০ দিনের মধ্যে এ শপথ অনুষ্ঠিত হতে হবে। তবে বিশেষ কারণের জন্য শপথ পরিচালনা কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে পরেও হতে পারে।

(৪) ইউনিয়ন পরিষদ (চেয়ারম্যান ও সদস্যদের) পরিতোষিক প্রদান বিধিমালা ১৯৮৫ :

বিধিমালাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের দায়িত্ব পালনের জন্য অতি সামান্য কিছু আর্থিক সুযোগ দেয়ার জন্য বিধান করা হয়েছে। বিধিমালাটিতে মাত্র ৩টি বিধি আছে। বলা হয়েছে প্রতি বছর চেয়ারম্যান ৬,০০০/- এবং প্রতি সদস্য ২৪০০/-

টাকা পাবেন। বস্তত: বিদ্যমান পরিস্থিতিতে পারিতোষিক হিসেবে চেয়ারম্যান বা সদস্যদের জন্য দেয় অর্থ অতি নগন্য। কিন্তু আর্থিক সুবিধার মাপকাঠিতে বিবেচনা না করে বিষয়টি সম্মান সূচক বিবেচনা করলে বিতর্ক এড়ানো যায়। তাছাড়া যারা জন প্রতিনিধি হতে আগ্রহী তাদের মূল লক্ষ্য হওয়ার কথাতো জনগণের সেবা করার জন্য সুযোগ প্রাপ্তি, অর্থ প্রাপ্তি নয়। জনগণকে সঠিক সেবাদান করা হলে জনগনের ভালোবাসা ও তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্মান অর্থের পরিমাণ দ্বারা নির্ধারণ সম্ভব নয়।

(৫) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্য (পদত্যাগ, অপসারণ ও পদশূন্যকরণ) বিধিমালা ১৯৮৪ :

উক্ত বিধিমালাটির শিরোনাম থেকে তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝা যায়। বিধিমালাটিতে ১৬টি বিধি আছে। উহার মধ্যে অপসারণ সংশ্লিষ্ট ধারাবাহিক ভাবে সংযোজিত বিধি সমূহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বস্তত: মূল অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর ১২- ধারাতে অপসারণের কারণ ও প্রক্রিয়ার কিছু বলা হইয়াছে। পূর্বে মূল অধ্যাদেশের ১২ (৩) ধারায় অনাস্থা নিয়ে বিধান করা হয়েছিল। যার উপর ভিত্তি করে বর্তমান বিধিমালার ১৬ নম্বর বিধি বিধান করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে অনাস্থা পোষনের সুযোগ বাদ দিয়ে অপসারণের বিষয়টি ও তৎ উদ্দেশ্যে প্রক্রিয়া নিয়ে বর্তমান বিধিমালার ৪-১২ নং বিধিতে বিবৃত হয়েছে। এই বিধিমালার বিষয়াবলী জনগণের ও ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিদের সুস্পষ্টভাবে অবহিত করার জন্য কোন না কোন প্রতিষ্ঠান থেকে স্বেচ্ছায় উদ্যোগ গ্রহণ করা বাঞ্চনীয়।

(৬) ইউনিয়নের সীমারেখার ঘোষণা ও পরিবর্তন বিধিমালা ১৯৮৩ :

এই বিধিমালাটি ইউনিয়নের সকল জনগণের অবহিতকরণের বিষয় হিসেবে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এতে ৬টি বিধি আছে। যেহেতু বিধিমালাটি প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য সেজন্য প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য যখন স্ব স্ব প্রতিনিধির ভৌগলিক সীমানা নির্ধারণ করা হয় সে সময় জনগণ, আগ্রহী প্রতিনিধি ও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তিনি বা তারা যথেষ্ট সতর্কতার সাথে বিষয়টি অনুধাবন করবেন। কেননা কোন অসৎ উদ্দেশ্য কর্তৃপক্ষের মধ্যে কাজ করলে কাউকে ন্যায় বর্হিভূত সুযোগ দানের পরিকল্পনা এমনভাবে সীমানা নির্দিষ্ট করতে পারে যাতে দেখা যাবে জনগণের আকাঙ্খার বিপরীত অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। এমন ক্ষেত্র নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন এমন প্রস্তাবিত ও স্বার্থান্বেষী প্রার্থীর সাথে যোগসাজসে সরকারেরর দায়িত্ব প্রাপ্ত অসাধু কর্মকর্তা মিলে সীমানা নির্ধারণকে কেন্দ্র করে কোন প্রার্থীর অনুকূলে ও কোন প্রার্থীর প্রতিকূলে সীমানা নির্ধারণ করতে পারেন। সেই জন্য ইউনিয়নের অধিবাসী হিসেবে জনগণের ও সম্ভাব্য প্রার্থীদের সচেতন থাকা দরকার, যাতে সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন প্রকার ন্যায়নীতি বিবর্জিত না হয়। উল্লেখ্য প্রস্তাবিত সীমানা নির্ধারণের সময় কোন প্রকার অভিযোগ উত্থাপনের সুযোগ প্রার্থীর অধিকার বিধিমালাতে বলা আছে।

(জ) কোন চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের সদস্য ও সংরক্ষিত আসন ব্যতীত সদস্য প্রার্থীর জন্য যথাক্রমে নয়টি, ছয়টি ও তিনটির অধিক নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করা যাবে না, কোন সড়ক কিংবা জনগনের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করা যাবে না, নির্বাচনী ক্যাম্প যথাসম্ভব অনাড়ম্বর হতে হবে, এবং নির্বাচনী ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনরূপ খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করা যাবে না;

(ঝ) সরকারী ডাক-বাংলো, রেষ্ট হাউস, সার্কিট হাউস অথবা কোন সরকারী কার্যালয়কে কোন প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারের স্থান হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না;

(ঞ) নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহার্য পোষ্টার দেশে তৈরী কাগজে সাদা-কালো রং এর হতে হবে এবং এর আয়তন কোন অবস্থাতেই ২৩"×১৮" এর অধিক হতে পারবে না;

(ট) কোন প্রার্থী একই সঙ্গে একটি ওয়ার্ডে একটির বেশি মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্র (Amplifier) ব্যবহার করতে পারবেন না এবং উক্ত মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের (Amplifier) ব্যবহার দুপুর ২.৩০ ঘটিকা হতে রাত ৮.০০ ঘটিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে;

(ঠ) কোন কালি বা রং দ্বারা বা অন্য যে কোনভাবে কোন দেওয়াল, দালান, থাম, বাড়ি-ঘরের ছাদ, সেতু, যানবাহন বা অন্য কোন স্থানে প্রচারণামূলক কোন লিখন বা অংকন করা যাবে না;

(ড) ট্রাক, বাস, মোটর সাইকেল কিংবা অন্য কোন যানবাহন সহকারে মিছিল কিংবা মশাল মিছিল বের করা যাবে না;

(ঢ) কোন প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারকালে কোন প্রকার তিক্ত উক্তানিমূলক বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোন বক্তব্য প্রদান করতে পারবেন না।

আচরণ বিধিমালাটিকে নিয়ে কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে জনগনের সামনা সামনি হয়ে যেমন একদিকে তাদের সে সম্বন্ধে সচেতন করে তা মেনে চলার জন্য উদ্বুদ্ধ করা দরকার তেমনি প্রয়োজন বোধে প্রচার পত্র বিলি করে জনসাধারণের জ্ঞান সমৃদ্ধ হবার সুযোগ সৃষ্টি অত্যাবশ্যক। এ সম্বন্ধে একটি সুষ্ঠু ও সহজ ধারণা নিতে হলে প্রথমে জাতীয় পর্যায়ের সরকারের গঠন প্রণালী ও তার দায় দায়িত্ব, ক্ষমতা ইত্যাদি সম্বন্ধে একটি ধারণা নেয়া দরকার।

আমরা জানি একটি সরকারের তিনটি অংগ : আইন, নির্বাহী ও বিচার। প্রশ্ন উঠতে পারে এই তিনটির গঠনপ্রণালী কিভাবে হয় বা হবে এবং এদের মধ্যে অধিক

ক্ষমতাশালী কোন অংগ। অথবা ক্ষেত্র বিশেষে এক এক অংগ এক এক ক্ষেত্রে অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন এবং তেমন হলে সুষ্ঠুভাবে জনস্বার্থে রাষ্ট্রের কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে এমন কোন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন কিনা সেখানে সকল অংগের মধ্যে সমঝোতার প্রয়োজন দেখা দিবে। তখন তা সৃষ্টি হবার পথে কোন অন্তরায় থাকবে না বা থাকলেও তা জাতীয় স্বার্থে উপেক্ষিত হবার পরিবেশ নির্মিত হবে।

আমাদের দেশের গণতন্ত্র পরিচালিত হয় ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত সংসদীয় পদ্ধতিতে। এর পাশাপাশি আর একটি পদ্ধতি আছে যাকে বলা হয় রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতি। দুটির মধ্যে কিছু কাঠামোগত পার্থক্য আছে, তবে লক্ষ অর্জনের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই এমন ভাবা যায়। সংসদীয় পদ্ধতিতে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্যরা একদিকে যেমন জাতীয় সংসদে বসে দেশের জনগণের সার্বিক কল্যাণের জন্য আইন প্রণয়ন করার দায়িত্বের অধিকারী। তেমনি ভাবে তাদের মধ্য থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠরা দেশের নির্বাহী সরকার গঠন করতেও অধিকারী। অর্থাৎ মন্ত্রীসভা গঠন, যার প্রধান থাকেন বা হন যিনি, তাকে বলা হয় প্রধান মন্ত্রী। মন্ত্রী সভার বাকিদের মন্ত্রী বলা হয়। দেশের নির্বাহী শাসন কাঠামো পরিচালনার জন্য জাতির চাহিদা অনুসারে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডকে কয়েকটি মন্ত্রণালয়ে বিভক্ত করা হয়, যার প্রধান হন একজন মন্ত্রী। কাজের বোঝা অনুসারে তাকে সহযোগিতা করার জন্য প্রতি মন্ত্রী বা উপমন্ত্রী ইত্যাদিও দায়িত্বে রাখা হয়। এতো গেলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত মন্ত্রী সভার রূপ। কিন্তু প্রশ্ন হলো ঐ সকল মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে নামাংকিত করলেও মন্ত্রণালয়ের মূলপ্রশাসনিক দায়িত্বের প্রধান কে ? মন্ত্রী না অন্য কেউ ? এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে অনুধাবনযোগ্য।

দেশের সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে সুষ্ঠুভাবে মন্ত্রণালয় সমূহের কার্য জনকল্যাণে সুচারুরূপে প্রতিপালিত হবার উদ্দেশে রুলস অব বিজিনেস নামে দায়িত্ব বিভাগ বন্টনের একটি বিধান আছে। আমাদের দেশে বর্তমানে যে রুলস অব বিজিনেস আছে তাতে জনগণের তথা তাদের প্রতিনিধিদের অধিকার ও ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে এবং তদস্থলে জনগণের প্রদত্ত রাজস্বের বিনিময় সৃষ্ট অর্থদ্বারা নিয়োজিত বেতনভুক্ত প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের ক্ষমতার প্রসার ঘটানো হয়েছে।

এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালনের সুবিধা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনে রুলস অব বিজিনেসের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন করে প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে মন্ত্রীদের দায়িত্ব পালনের ব্যবস্থা করতে হবে। এবং সেক্ষেত্রে প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে লিখিত ও দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণ করবেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, সচিব নয়। উপনিবেশিক

আমল থেকে চলে আসা মন্ত্রণালয়ের সচিবকে প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে পরিগনিত করায় জনগণের কাছে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জবাবদিহিতার অভাব সৃষ্টি হয় এবং সেই সুযোগ নির্বাচিত প্রতিনিধিরা গ্রহণ করে নিজেদের কৃত অপকর্মকে চাপা দেয়ার ক্ষেত্র গড়ে তোলেন। জনগণ বোকার ন্যায় ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। প্রশাসন পরিচালনায় মন্ত্রীদের কোন ক্ষমতা থাকে না। সেই প্রেক্ষাপটে প্রশাসনিক একাংশের সকল স্তরের শাসন কাঠামোতে পরিবর্তন আনতে হবে। তার জন্য পুরাতন ধ্যান ধারণার বেশ কিছু পরিবর্তন আবশ্যিক হয়ে পড়বে। উপনিবেশিক ধ্যান ধারণার মানসিকতা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবার আশঙ্কা সব সময়ই বিরাজমান। তাকে ঝেড়ে ফেলার জন্য বলিষ্ট ভূমিকার দরকার। অন্যথায় আমাদের সামনে এগিয়ে যাবার পথ অবরুদ্ধ হয়ে থাকবে। কাংখিত উন্নয়ন ও জাতীয় অগ্রগতি সম্ভব হবে না বরং তমসাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে ; মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতির ললাটে অংকিত হবে বেদনা দায়ক দূঃখজনক চিত্র।

যা থেকে সাহায্য গ্রহণ ঃ

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।
২. ইউনিয়ন পরিষদ এবং গ্রাম সরকার ম্যানুয়াল।
লেখক ঃ সৈয়দ নূরুল হুদা, সৈয়দা রুখসানা।
৩. গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬।
৪. গণমুখী প্রশাসন সংস্কার আন্দোলন, এ্যাডভ মোঃ এনায়েত আলী।